৩

ব্রিটিশ সংশ্রব

ব্রিটিশ সংশ্রব

উত্তর পূর্ব ভারতের ছোট্ট স্বাধীন রাজ্য ছিল কোচবিহার। সমগ্র ভারতবর্ষের রাজতন্ত্রের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে যে সকল প্রতিকূল বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় কোচবিহার রাজ্যের ক্ষেত্রেও তার সামান্যতম ব্যতিক্রম ছিল না। "বিশেষ করে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে কোচবিহার রাজ্যে পারিপার্শ্বিক, পারিবারিক, অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক সকল দিক থেকেই এক বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু যার সুষ্ঠু সমাধানে কোচবিহারের রাজন্যবর্গ ছিলেন অক্ষম সেই পরিস্থিতিতে রাজা ধরেন্দ্র নারায়ণের রাজত্বকালে ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ৫ই এপ্রিল কোচবিহার রাজ্যের সঙ্গে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল।"[১] উক্ত চুক্তির ফলে প্রবল ঝড়ের প্রকোপ থেকে কিছুটা মুক্তি পেলেও রাজ্যের স্বাধীনতা কিছুটা বিনষ্ট হয়েছিল। ব্রিটিশদের আগমনের পূর্বে কোচবিহার রাজ্য মহারাজা বিশ্বসিংহের সময় হতে স্বাধীনভাবে পরিচালিত হয়ে আসছিল। তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি কোচবিহার রাজ্যে ব্রিটিশদের পাশ্চাত্য প্রাধান্য বিস্তারে কিভাবে সাহায্য করেছিল তা এখানে আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

"ষোড়শ শতাব্দীতে যখন বিশ্বসিংহ একজন উপজাতীয় নেতার পুত্র হিসাবে কোচবিহার রাজ্যের সিংহাসনে বসেন কোচরাজবংশের উৎপত্তি সেই সময় থেকেই বলা চলে।"[২] "বিশ্বসিংহের পুত্র মহারাজা নরনারায়ণের রাজত্বকালে কোচবিহারের রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক সীমারেখা সমস্ত উত্তর-পূর্ব ভূখণ্ড পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।"[৩] হড্‌সন্-এর কথায় কোচবিহার রাজ্যের সীমারেখা একদিকে আসামের পশ্চিমাঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত ছিল, অপরদিকে মোরাঙ্গের পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত এবং ধনশ্রী ও কন্‌কি নদীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত এবং উত্তরে তিব্বত ও দক্ষিণে ঘোড়াঘাট নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। "অন্যকথায় বলা যায় কোচবিহার রাজ্য ৮৮° থেকে ৯৩ ½° পূর্ব দ্রাঘিমারেখা এবং ২৫° থেকে ২৭° উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।"[৪]

কোচবিহার রাজ্যের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এই রাজ্যের প্রথম সূত্রপাত থেকেই এই রাজ্যের শাসকরা ভারতের মোঘলদের মত বিভিন্ন রাজপরিবারের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে সামাজিক যোগসূত্র স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এর ফলে কোচবংশের মধ্যে সমন্বয়ের মূল বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছিল এবং এর কিছুদিনের মধ্যে পারস্পরিক পরিচয়ের মাধ্যমে আধুনিকতার গতি সঞ্চারিত হয়েছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কোচবিহার রাজ্যের ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক সীমারেখা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে মোঘলদের প্রাধান্য কিছুটা স্থগিত হয়েছিল। "অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঔরঙ্গজেবের আমলে মীরজুমলা কর্ত্তৃক কোচবিহার রাজ্যের সীমারেখা বারংবার লঙ্ঘিত হতে থাকে এবং এর ফলে কোচবিহার রাজ্যের সীমা সংকীর্ণতা লাভ করে এবং কোচবিহার একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হয়।"[৫]

"কোচবিহার ক্ষুদ্র রাজ্য হলেও ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলায় শাসন ক্ষমতা লাভের সময় পর্যন্ত ইহা সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজ্য হিসাবে পরিচিত ছিল। এর কারণও খুব সুস্পষ্ট ছিল অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব বাংলার সীমানাঘেষা কোচবিহার রাজ্যটি তদানীন্তনকালে ভুটান রাজ্য ও ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী শাসিত বাংলার মধ্যে একটা সীমান্ত রাজ্য হিসাবে বিবেচিত হ'ত।"[৬]

" পশ্চিমবঙ্গের Land Records and Surveys - এর অধিকর্তার বক্তব্য অনুসারে কোচবিহার রাজ্য ১,৩৩২,৬ বর্গমাইল ব্যাপী অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল।"[৭] উত্তরে ভূটান, পূর্বে আসাম ও ব্রহ্মপুত্র নদ, পশ্চিমে তিস্তা নদী এবং দক্ষিণে রংপুর জেলা পর্যন্ত কোচবিহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। সারা বৎসর ধরে তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্র নদের জলপথে যাতায়াত চলত। বাস্তবিক পক্ষে তদানীন্তন সময়ে নিম্ন হিমালয় অঞ্চলে জলপথেই যাতায়াত ব্যবস্থার বেশী প্রচলন ছিল। কোচবিহার রাজ্যের গুরুত্ব ছিল তার বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য।

সমগ্র ভারতবর্ষের রাজতন্ত্রের ক্ষুদ্র সংস্করণ হল কোচবিহারের রাজতন্ত্র। সুতরাং রাজসিংহাসন নিয়ে কলহ বিবাদ লেগেই থাকত কারণ হিসাবে বলা যায় সঠিক উত্তরাধিকারী আইনের অভাব। যার ফলে দেখা যায় "রাজা উপেন্দ্র নারায়ণের মৃত্যুর পর যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল তার ফলে কোচবিহার রাজবংশ সাংঘাতিক ধরণের এক অন্তর্দ্বন্দ্বের মুখোমুখী হয়। সঠিক উত্তরাধিকারী নিয়ে রাজবাড়ীর সম্ভ্রান্ত ও প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন। অবশেষে স্বর্গত মহারাজা উপেন্দ্র নারায়ণের নাবালক পুত্র দেবেন্দ্র নারায়ণ রাজসিংহাসনে বসেন। নাবালক রাজা দেবেন্দ্র নারায়ণের নামে এক মন্ত্রী পরিষদ রাজকার্য পরিচালনা করতে থাকেন।"[৮]

রাজ পরিবারের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে পার্শ্ববর্তী রাজ্য ভূটান কোচবিহারের শাসনকার্যে প্রভাব খাটাতে শুরু করে। "ভূটানের এই প্রভাব এতটাই শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে একদল ভূটানী প্রতিনিধি একদল ভূটানী সৈন্য নিয়ে কোচবিহার রাজ্যের ভিতর সর্বদা অবস্থান করতে শুরু করে। এই ভূটানী প্রতিনিধিদের ক্ষমতা এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে তাঁদের সম্মতি ছাড়া কোচবিহারের শাসনকার্যের কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত কার্যকর করা যেত না।"[৯]

"এই সময় ভূটানী প্রতিনিধি Pensutama কোচবিহার রাজ্যের দেওয়ান দেও রাম নারায়ণের খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেন। দেওয়ান দেও ভূটানীদের সংস্পর্শে খুব-ই শক্তিশালী হয়ে উঠলে কোচবিহার রাজপ্রাসাদের উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দ ও রাজা নিজে দেওয়ান দেও-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে দেওয়ান দেওকে হত্যা করেন।"[১০] উক্ত হত্যাকাণ্ডে ভূটানী দেবরাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। উপরে উল্লিখিত মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য ভূটানের দেবরাজ তদানীন্তন কোচবিহারের মহারাজা ধৈর্য্যেন্দ্র নারায়ণ ও তাঁর নাজির দেও-এর বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। রাজা ও নাজির দেও উভয়কে কৌশলে একসঙ্গে ধরবার জন্য তাঁদেরকে এক 'ভোজসভাতে' আমন্ত্রণ করা হয়। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে 'Chechakhata' ভোজসভাতে কোচবিহারের মহারাজা ও তাঁর নাজির দেওকে ভূটানীরা কৌশলে বন্দী করে তুলে নিয়ে যান এবং তাঁরা বন্দী রাজার ভাই রাজেন্দ্র নারায়ণকে সিংহাসনে বসান কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিজেরাই (ভূটানীরা) কোচবিহারের শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে রাজেন্দ্র নারায়ণের মৃত্যু হয়। "মহারাজা রাজেন্দ্র নারায়ণের অকালমৃত্যুর সংবাদ শুনে নাজিরদেও খগেন্দ্র নারায়ণ ভূটানের বন্দীদশা থেকে পালিয়ে আসেন এবং তিনি বন্দী ধর্য্যেন্দ্র নারায়ণের পুত্র ধরেন্দ্র নারায়ণকে কোচবিহারের রাজসিংহাসনে বসান।"[১১] বাস্তবিক পক্ষে ভূটানের দেবরাজ এই ঘটনাকে তাঁর কর্তৃপক্ষের অবমাননা বলে মনে করেন এবং এটা তিনি অপছন্দ করতেন যে একজন বন্দীর ছেলে কোচবিহার রাজ্যের রাজসিংহাসনে বসবেন এবং নাজির দেও খগেন্দ্র নারায়ণকে রাজা নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করেন। প্রতিশোধ গ্রহণের বাসনায় ভূটানীরা একজন ভূটানী সেনাধ্যক্ষ 'জিম্পের' তত্ত্বাবধানে পাহাড় থেকে নীচে নেমে আসেন এবং ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে কোচবিহার রাজ্যে একদল সৈন্য মোতায়েন করেন। এইভাবে রাজতন্ত্রের কূটীল ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ভূটানীরা কোচবিহার রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক কর্তৃত্ব হাতে পেয়ে যান। "নাজির দেও খগেন্দ্র নারায়ণ এবং রাজা ধরেন্দ্র নারায়ণ কোচবিহার রাজ্য থেকে পালিয়ে গিয়ে রংপুরে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর Collector-এর সাহায্য প্রার্থনা করেন।"[১২]

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে সুযোগ এসে যায়। ব্রিটিশ শাসকগণ কোচবিহার রাজ্যের গুরুত্ব বুঝে ফেলেন। এই ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা ও সকল বিষয়ে আধিপত্য খাটানোর সুযোগ নেয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। নাজীর দেও খগেন্দ্র নারায়ণ কোম্পানীর সাহায্য চেয়েছিল ভূটানীদের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য এবং কোচবিহার রাজ্যকে ভূটানীদের হাত থেকে উদ্ধার করবার জন্য। "এতদিন ধরে নিজেদের সীমানার কাছেই ভূটানীদের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা বৃদ্ধি ইংরেজরা প্রত্যক্ষ করছিল। স্বাভাবিকভাবেই কিছু শর্ত সাপেক্ষে নাজীর দেওয়ের সাহায্যের আবেদন ইংরেজরা সাদরে গ্রহণ করেছিলেন।"[১৩] "রাজা ধরেন্দ্র নারায়ণ ও ইংরেজদের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এটা খুব-ই আশ্চর্যের বিষয় যে, যখন উক্ত চুক্তি বাস্তবায়িত হতে চলেছে তখন-ই রংপুরে Collector মি. পার্লিং ভূটানী সৈন্যদের মোকাবিলার জন্য একদল কোম্পানী সৈন্য পাঠিয়ে দেন। চুক্তির প্রস্তাব সভাপতি ও তাঁর পরিষদের কাছে মি. পার্লিং পাঠিয়ে দেন এবং শেষ পর্যন্ত গভর্ণর জেনারেল ও তাঁর পরিষদ উক্ত প্রস্তাব অনুমোদন করেন।"[১৪] কোম্পানীর সৈন্যরা কোচবিহার রাজ্য থেকে ভূটানীদের বের করে দেন। তদানীন্তন কোচবিহারের মহারাজা ধরেন্দ্র নারায়ণ এবং নাজীর দেও খগেন্দ্র নারায়ণ তাঁদের হৃত রাজ্য উদ্ধার করেন বটে কিন্তু এটা তাঁদের সার্বভৌম ক্ষমতার পরিবর্তে। চুক্তির শর্তানুসারে নাজীরদেও খগেন্দ্র নারায়ণ কোচবিহার রাজ্যের পক্ষে চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করেন এবং ইংরেজদের অধীনতা স্বীকার করে নেন এবং রাজ্যের এক অর্ধাংশ রাজস্ব তাঁদেরকে দিতে

স্বীকৃত হন। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষ হতে Government Council-এর অধ্যক্ষ উক্ত চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন। অবশেষে "৫ই এপ্রিল ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ ১১৭৯ বঙ্গাব্দের ৬ই মাঘ -এ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সাথে কোচবিহার রাজ্যের সন্ধি স্থাপিত হয়েছিল।"[১৫] উক্ত সন্ধির বিষয়-বস্তুগুলি ছিল নিম্নরূপ ঃ

"১. কোচবিহারের মহারাজা তাঁর সাহায্যার্থে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রেরিত সৈন্যদলের ব্যয় নির্বাহার্থে অবিলম্বে রংপুরের কালেক্টরের হাতে ৫০,০০০ টাকা দেবেন।

২. যদি ৫০,০০০ টাকার অতিরিক্ত কিছু খরচ হয় তবে রাজা তা মাননীয় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে দেবেন কিন্তু যদি ঐ টাকার কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তবে তিনি ফেরত পাবেন।

৩. কোচবিহার রাজ্য শত্রু মুক্ত হলে রাজা ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধীনতা স্বীকার করবেন এবং তাঁর রাজ্যকে বঙ্গদেশের সঙ্গে সংযোজিত হতে দেবেন।

৪. রাজা আরও অঙ্গীকার করেছেন যে কোচবিহার রাজ্যের বার্ষিক রাজস্বের অর্ধেক ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে চিরকাল দেবেন।

৫. যদি কোচবিহারের মহারাজা মাননীয় ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়ার প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন তবে রাজস্বের অপরার্ধ চিরকাল তাঁর এবং তাঁর উত্তরাধিকারীগণের থাকবে।

৬. কোচবিহার রাজ্যের আয় স্থির করার জন্য কলিকাতাস্থ মাননীয় প্রেসিডেন্ট (কোথাও আছে কাউন্সিলের মাননীয় প্রেসিডেন্ট) এবং কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তির নিকট রাজা একখানি 'হস্তবুদ' (রাজস্ব নিরূপক হিসাব) দেবেন এবং তদনুসারে রাজার দেয় বার্ষিক 'মালগুজারীর' পরিমাণ নির্দিষ্ট হবে।

৭. মাননীয় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নিয়োজিত ব্যক্তি কর্তৃক নির্ধারিত 'মালগুজারীর' পরিমাণ চিরস্থায়ী হবে।

৮. রাজ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজন হলে মাননীয় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী রাজাকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করবেন, তবে তার ব্যয়ভার রাজাকেই বহন করতে হবে।

৯. এই সন্ধি দুইবছরকাল অথবা 'কোর্ট অব ডিরেক্টর' কর্তৃক প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিলকে এই সন্ধি চিরকালের জন্য বহাল করার ক্ষমতা প্রদানের সংবাদ পাওয়ার সময় পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।"[১৬]

ক্যাপ্টেন জোন্সের নেতৃত্বে কোম্পানীর সৈন্যদল ভূটানীদের পাহাড় পর্যন্ত ঠেলে দিল এবং এই মুহূর্তে ভূটানের দেবরাজ তিব্বতের টেসুলামার মধ্যস্থতা চাইলে তাঁর মধ্যস্থতায় ভূটানীদের সঙ্গে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল এবং এক সন্ধির শর্তানুসারে মহারাজা ধর্য্যেন্দ্র নারায়ণ ও তাঁর দেওয়ানকে মুক্তি দেয়া হয়। মহারাজা বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে পুনরায় রাজসিংহাসনে বসতে অস্বীকার করেন এবং তাঁর পুত্র পূর্ববর্তী কোচবিহারের মহারাজা ধরেন্দ্র নারায়ণকে কোচবিহারের রাজা হিসাবে কাজ চালিয়ে যেতে বলেন। এর কারণ হল বন্দী রাজা কোচবিহারের সঙ্গে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের চুক্তির শর্তাদিতে বিরক্ত হয়েছিলেন। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের চুক্তির শর্তে কোচবিহার রাজ্যের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হয়েছিল এবং কোচবিহার ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একটি করদ মিত্র রাজ্যে পরিণত হয়েছিল।

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কোচবিহারের বিষয়ে কেন হস্তক্ষেপ করেছিল এর কারণ বুঝতে খুব অসুবিধা হয় না। "রাজনৈতিক স্বার্থ অর্থাৎ কোম্পানীর বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে ক্রমবর্ধমান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষাই ছিল প্রধান লক্ষ। এই প্রসঙ্গে বাংলার গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের মনোভাব স্মরণীয়। ওয়ারেন হেষ্টিংস নূতন ভূমি খণ্ড দখলের সুযোগ পেয়ে খুশী হন যদিও তিনি যুদ্ধ জয়ের কর্মধারার চেয়ে অন্য উপায়ে কোম্পানীর সাম্রাজ্যের পরিসীমা সম্পূর্ণ করার পক্ষপাতী ছিলেন।"[১৭]

দ্বিতীয়ত ঃ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়াও ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ব্যবসাগত স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। হিমালয় অঞ্চলে এতদিন পর্যন্ত কোম্পানীর ব্যবসাপত্র নেপালের মাধ্যমে চলত। কিন্তু নেপালের রাজনৈতিক অস্থিরতা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসাপত্র দারুণভাবে ব্যহত হচ্ছিল। এর ফলে কোম্পানী ব্যবসার গতিপথ পরিবর্তন করতে আগ্রহী হয়েছিল। তদানীন্তনকালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী নেপালের পরিবর্তে ভূটানের মাধ্যমে তিব্বতে এবং আসাম ও কোচবিহারের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য

করবার জন্য আগ্রহী ছিলেন। "এ বিষয়ে ওয়ারেন হেষ্টিংসের নীতি হ'ল 'গোরখাদের' এড়িয়ে চলা কিন্তু ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এবং ভূটানের মধ্যে সম্পর্ক তখনও নিবিড় হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই এতদঅঞ্চলে ভূটানীদের কোচবিহার দখল কোম্পানীর ব্যবসাপত্রের স্বার্থ বিঘ্নিত হত। সুতরাং স্বাধীনভাবে ব্যবসার গতিপথ প্রতিষ্ঠিত করতে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ভূটানের সঙ্গে যুদ্ধের প্রয়োজন ছিল।"[১৮]

তৃতীয়ত ঃ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কোচবিহার এবং তার আশেপাশের অঞ্চলে সন্ন্যাসীদের কার্যকলাপে বিব্রত হয়ে উঠেছিল এবং সেই সঙ্গে ঐসব অঞ্চলের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। সন্ন্যাসীদের সংযত রাখা ব্রিটিশদের কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে। সুতরাং ভূটানীদের সঙ্গে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সন্ধি হয় তখন সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে একটা শর্ত ঐ সন্ধিতে স্থান পায়। শর্তটি হোল, "দেবরাজকে যে সমস্ত স্থান ছাড়িয়া দেওয়া হইল, ইংরেজরা, সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে যাহাদিগকে শত্রু বলিয়া মনে করিবেন, তিনি তাহাদিগের কাহাকেও ঐ সমস্ত স্থানের কোনও অংশ আশ্রয় গ্রহণ করিতে দিবেন না এবং তাহাদিগকে মহামান্য কোম্পানীর অধিকারে অথবা তাঁহার রাজ্যের কোনও অংশে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিবেন না। যদ্যপি ভূটীয়ারা তাহাদিগকে বিতাড়িত করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহারা কোচবিহারের ইংরেজ রেসিডেন্টকে তৎসংবাদ প্রদান করিবে। সন্ন্যাসীদিগের অনুসরণ করিতে ইংরেজ সৈন্য ঐ অঞ্চলে প্রবেশ করিলে তাহার দ্বারা এই সন্ধি ভঙ্গ হওয়া বিবেচিত হইবে না।"[১৯]

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা স্বীকার করা যায় যে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কোচবিহার রাজ্য সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন নীতি গ্রহণ করেনি যদিও স্থানীয় রাজ্যগুলোর অবলুপ্তির ধারা অব্যাহত ছিল।

এইভাবে রংপুরের কালেকটরের নিকট যখন কোচবিহারের নাজীর দেও আবেদন করেছিল, তখন কলিকাতাস্থিত ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াই উক্ত আবেদন গৃহীত হয়েছিল এবং আক্রমণকারী ভূটানীদের দমন করতে সৈন্য পাঠানো হয়েছিল।

অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, কলহ, বিবাদ, বিসংবাদ এবং বৈদেশিক আক্রমণের ফলশ্রুতি হিসেবে কোচবিহারে ব্রিটিশদের অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়। এই সমস্ত কারণে কোম্পানীর আগমনের পূর্বের সময়কে কোচবিহার ইতিহাসের 'দ্বিধান্দ্বময়' যুগ নামে অভিহিত করা হয়। যদিও ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধির তৃতীয় অংশে ভারতে কোম্পানীর রাজত্বের সঙ্গে কোচবিহার রাজ্যের অধীনতা সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করা হয়েছিল, তথাপি দুটো কারণে কোচবিহার রাজ্যে ব্রিটিশদের সম্পূর্ণ অধিকার কার্যকরী করা হয়নি। প্রথমত ঃ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তার সমস্ত মনোযোগ দিয়ে মধ্য ও পশ্চিম ভারতে নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধিতে ব্যস্ত ছিল। দ্বিতীয়ত ঃ সহজতরভাবে এই ক্ষুদ্র রাজ্য কোচবিহারে আনুগত্য বিশেষ করে ধরেন্দ্র নারায়ণের সিংহাসন উদ্ধারের পর প্রশ্নাতীত ভাবে স্বীকৃত হয়।

কোম্পানী বিশেষভাবে উক্ত চুক্তি দ্বারা যে রাজস্ব লাভের ব্যবস্থা হয় তাতেই সন্তুষ্ট ছিল। রংপুরের কালেক্টর ঐ রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করেন। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানীর মনোনীত তহশীলদারের মাধ্যমে রাজ্যের সম্পূর্ণ রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। সন্ধির শর্তানুসারে আদায়ীকৃত অর্থের অর্ধাংশ তহশীলদার সরকারকে দিয়ে দিত এবং বাকী অর্ধাংশ কোচবিহার রাজ্যকে দেয়া হ'ত। ইংরেজ প্রতিনিধি মেজর ফ্রান্সিস জেনকিন্সের প্রতিবেদনের কিছু উল্লেখ করে বিষয়টি সম্পর্কে আরো সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। কোচবিহারে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব এ যাবৎ রংপুরের কালেক্টারের উপর ন্যস্ত ছিল। যাঁর উপর ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের চুক্তি অনুযায়ী প্রাপ্য রাজস্ব আদায়ের ভার ও অর্পিত ছিল এবং দেখা যায় ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁরা আমাদের সরকারের প্রাপ্য আদায় করেছেন। তাঁদের দ্বারা নিযুক্ত সাজোয়ালদের কোচবিহারের সমুদয় রাজস্ব আদায়ের ভার অর্পন করে এবং সাজোয়ালগণ উক্ত অর্থ হতে সরকারের অংশ কেটে রেখেছেন এবং বাকী অর্ধাংশ রাজার কোষাগারে জমা দিয়েছেন। করের ঐ পরিমাণ, অবশ্য ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে স্থায়ী ভাবে নির্দিষ্ট হয়, যখন রাজার রাজস্বের বাৎসরিক হিসাবের 'হস্তাবুদ' তৈরী করার জন্য মি. পার্লিংকে নিয়োগ করা হয়। এই বৎসর থেকে করের পরিমাণ নির্দিষ্ট হয়, কিন্তু পরবর্তীকালে আট বা নয় বছর 'সাজোয়ালের' মাধ্যমে, যারা কালেক্টারের দ্বারা নয়, পক্ষান্তরে রাজা দেবী সিং দ্বারা নিযুক্ত, যিনি সে সময়

রংপুরের সকল রাজস্ব সংগ্রহ করতেন, ২ বা ৩ বছরের জন্য নিযুক্ত হয়েছিল। পূর্বের রীতি-নীতি মত রাজস্ব সংগৃহীত হত।

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা কালেক্টারের হাতে থাকায় কোচবিহারে রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁরা যথেচ্ছ হস্তক্ষেপ করতেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কোচবিহার রাজার টাকশাল বন্ধ করা, যেখানে অজুহাত হিসেবে বলা হয়েছে নারায়ণী টাকা সর্বত্র সহজ গ্রাহ্য নয়, সেই কারণ হিসেবে প্রতি মাসে এক হাজার মুদ্রা তৈরীর সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন এবং রাজার মুখ্য আধিকারিকদের অবাধ্যতার অভিযোগে বরখাস্ত, আটক এবং অন্যান্য শাস্তি দেয়া হয়েছিল। বিরোধী পক্ষের নালিশের ভিত্তিতে গঠিত অভিযোগগুলোর জবাব দিহি করার জন্য তাঁদের রংপুরে যখন ডাকা হয়, তখন একজন কালেক্টার নাজির দেও-এর সমর্থন এবং অপরজন রাণীকে সমর্থন করেন।

ইত্যবসরে রাণীর সরকার এবং তাঁর মন্ত্রী এবং নাজির দেও-এর বিরোধীতায় রাজ্যে এক অরাজকতার সৃষ্টি হয়। অবশেষে রাজ্যের মুখ্য আধিকারিকগণ এবং রাজপরিবারের প্রধান সদস্যগণ নাজিরদেও, দেওয়ানদেও, ডাঙ্গরদেও এবং অন্যান্যরা তাঁদের সমস্ত জমিজমা থেকে বঞ্চিত হন, এবং তাঁদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। তাঁরা সকলে একত্রে চক্রান্ত করে সৈন্যদল গঠন করেন এবং ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজবাড়ী আক্রমণ করেন এবং রাজা, রাণী ও গোঁসাইকে বন্দী করে বলরামপুরে নাজিরদেও-এর গৃহে নিয়ে যান। নাজিরদেও অবশ্য স্বয়ং সে সময় রাজ্য থেকে নির্বাসিত ছিলেন এবং পরবর্তীকালে অধিক নিরাপত্তার জন্য আসামে চলে যান।

এই ঘটনা রংপুরের কালেক্টারের তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপের কারণ হয়, এবং বলরামপুরে সৈন্যবাহিনীর একটি দলকে পাঠিয়ে উত্তেজনায় সংশ্লিষ্ট প্রদান ব্যক্তিদের আটক করা হয় এবং রংপুরে নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রেখে সরকারী সিদ্ধান্তের জন্য তাঁরা অপেক্ষা করতে থাকেন।

কোচবিহারের এই অরাজকতার বিষয়ে প্রায়ই পূর্ব থেকেই বিবাদমান দুই গোষ্ঠী আবেদনের মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছিল। (মারকুইস্ কর্ণওয়ালিস্ এই সময়ে গভর্ণর জেনারেল ছিলেন)। সর্বশেষ হিংস্রতার ফলে সরকার ২রা এপ্রিল ১৭৮৮-এর সিদ্ধান্ততে স্থির হয় যে লরেন্স মার্শ এবং জন লুইস শোভেটকে প্রেরণ করে উভয় পক্ষের ন্যায্যদাবী এবং রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন বিষয় ও পন্থার উপর একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করা যাতে ভবিষ্যতে এর উন্নততর পরিচালনার জন্য ব্রিটিশ প্রভাব প্রয়োগ করা উচিত হবে।

"কমিশনারগণ ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মে রংপুরে তাঁদের কাজ আরম্ভ করেন এবং এ বিষয়ে তদন্ত পরিচালনার জন্য মোগলহাট এবং কোচবিহারে ২৯শে অক্টোবর পর্যন্ত অবস্থান করেন এবং ঐ বছরের ১০ই ডিসেম্বর তাঁরা তাঁদের রিপোর্ট পেশ করেন।" [২০]

ইতিমধ্যে কোচবিহারের মহারাজা ধরেন্দ্র নারায়ণের মৃত্যু হয় এবং তাঁর পিতা ধৈর্যেন্দ্র নারায়ণ পুনরায় কোচবিহারের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তিনি কোচবিহার রাজ্যের সার্বভৌম ক্ষমতার বিলোপে বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। ধৈর্যেন্দ্র নারায়ণ 'টোবিয়াসওয়াগনার' মাধ্যমে ওয়ারেন হেস্টিংসের করা চুক্তির শর্তের সংশোধনে সচেষ্ট হলে গভর্ণর জেনারেল ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধি চুক্তির কোনরূপ পরিবর্তন করতে সম্মতি প্রকাশ করেন নাই বরঞ্চ মহারাজা ধৈর্যেন্দ্র নারায়ণ 'ইউরোপীয় ভবঘুরে' অ্যাখ্যা পেয়েছিলেন।

"রাজা ধৈর্যেন্দ্র নারায়ণ বৃদ্ধ ছিলেন এবং সেজন্য তিনি সুষ্ঠভাবে রাজকার্য্য পরিচালনায় অসমর্থ ছিলেন। ফলে রাজ্যের শাসনভার মহারাণী কামতেশ্বরী এবং তাঁর প্রতিনিধি শর্বানন্দ গোঁসাই-এর হাতে ন্যস্ত হয়। কিন্তু বৃদ্ধ রাজা বিকৃত মস্তিষ্ক হন এবং নামেই শুধু রাজা থাকেন।"[২১]

রাজা ধৈর্য্যেন্দ্র নারায়ণের মৃত্যুর সময়ে মাত্র তিন বংসরের হরেন্দ্র নারায়ণকে সিংহাসনে বসানো হয় এবং এর ফলস্বরূপ কোচবিহার রাজ্যের রাজপরিবারের মধ্যে এক অভ্যন্তরীণ বিরোধ সৃষ্টি হয়। "মৃত রাজা ধৈর্য্যেন্দ্র নারায়ণের এক উইল বলে মহারাণী কামতেশ্বরী রাজার অভিভাবিকা হিসাবে রাজকার্য পরিচালনা করবেন, কিন্তু তার সঙ্গে দেওয়ান ও নাজিরদেও-এর

মধ্যে প্রতিযোগিতায় অবস্থা আরও ঘোড়ালো হয়ে ওঠে। সর্বাধিক ক্ষমতা সম্পন্ন রাজগুরু শর্বানন্দ গোঁসাই-এর সাহায্য মহারাণী পেয়েছিলেন। এই নিয়ে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হ'ল এবং দ্বন্দ্বের বিষয় হল রাজা দেওয়ান দেও এবং নাজির দেও-এর মধ্যে রাজস্বের অংশ নিয়ে। বিষয়টি আরও জটিল হল যখন রংপুরের কালেক্টর অবৈধ হস্তক্ষেপ শুরু করে।"[২২] তের বৎসর ধরে উক্ত ঝামেলা থাকার জন্য রাজ্যের শাসনব্যবস্থা, রাজ্যের স্থিরতা ও শান্তি বিঘ্নিত হয়। নাজির দেও আরও অধিক ক্ষমতা ও সুযোগ লাভের আশায় 'রাজকীয় শিলমোহর' (Royal Seal) নিজ হস্তগত করেন এবং নিজপুত্রকে যুবরাজ বলে ঘোষণা করেন। এইরকম পরিস্থিতিতে রংপুরের কালেক্টর রাজকীয় শিলমোহর উদ্ধার করে মহারাণীকে তা দিয়ে দেন। এতেও অশান্তি দূর হল না এবং রাজপ্রাসাদের ষড়যন্ত্র অপ্রতিরোদ্ধভাবে চলতে থাকে। "মহারাণী শর্বানন্দ গোঁসাই-এর সাহায্যে নাজির দেওকে রাজস্বের ভাগ থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করেন। ফলে রাজার পক্ষে মহারাণী ও গোঁসাই এবং অপর পক্ষ নাজির দেও এর মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ প্রায়ই লেগে থাকত। অবস্থা এরকম পর্যায়ে চলে গেল যে কোম্পানী তার নিজের স্বার্থে রাজ্যের বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করে থাকতে পারে নি।"[২৩] এইভাবে কোচবিহার রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করাটা ব্রিটিশদের একটা স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হয়।

রাজ্যের এই অস্থিরতা শুধুমাত্র রাজ্যের শাসনব্যবস্থাকেই নষ্ট করেনি উপরন্তু রাজস্বের পরিমাণও দারুণভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। অত্যাচারিত রাইয়তরা নিজেদের জন্মদেশ ছেড়ে চলে যায় এবং তার ফলে রাজস্বে ঘাটতি হয় এবং জমি হস্তান্তর হওয়ায় অবশিষ্ট অধিবাসীরা রাজস্ব ঘাটতি মিটাতে বাধ্য হয়। সুতরাং শুধুমাত্র রাজনৈতিক অস্থিরতাই নয়, উপরন্তু পরবর্তী বৎসরগুলোতে রাজস্ব ঘাটতির বিষয়টা কোম্পানীকে ভরিয়ে তুলল এবং তার ফলে তাঁরা উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়। ইতিমধ্যে রংপুরের কালেক্টর বদলী হন এবং গুড্‌লেডের স্থলে পিটার মুর রংপুরের কালেক্টর হন। নূতন কালেক্টর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দ্রুত হস্তক্ষেপ করেন। এর ফলে কোচবিহার রাজ্যে ব্রিটিশদের নিয়ত হস্তক্ষেপ একটা বাস্তব ঘটনায় পরিণত হয়।

এরপর রাজ্যের অবস্থা আরও খারাপ হয়। "মারিচমতি, নাজির দেও-এর কাকা (Marichmati, the aunt of Nazir Deo), সন্ন্যাসী নেতা গনেশগিরি এবং নাজির দেও-এর জ্যেষ্ঠভ্রাতা ভগবন্ত কুমার নারায়ণ রাজা ও রাণীকে ধরে নিয়ে বলরামপুরে বন্দী করে রাখেন এই 'রাজদ্রোহের' অভাবনীয় ঘটনায় কোম্পানীর হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয় এবং ক্যাপ্টেন রতন রাজাকে মুক্ত করেন এবং তাঁদেরকে রাজধানীতে ফেরৎ পাঠান।"[২৪]

বাংলার প্রতিবেশী রাজ্যে এরকম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির জন্য গভর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিশ ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিলের এক সিদ্ধান্তে লরেন্স মার্শে এবং জন লুইস চৌভেটকে নিয়ে একটি কমিশন গঠন করেন। বিবদ-মান গোষ্ঠীর মতপার্থক্য একাধারে দূর করার জন্য এবং অপরপক্ষে কোচবিহারের শাসনব্যবস্থার উপর একটি 'প্রতিবেদন' পাঠানোর উদ্দেশ্যে উক্ত কমিশন গঠিত হয়েছিল। কমিশনের সদস্যগণ সকল বিষয় অনুসন্ধান করেন এবং বিবদমান গোষ্ঠীর সকলের মতামত গ্রহণ করেন। পরিশেষে তাঁরা একটি 'প্রতিবেদন' (report) প্রেরণ করেন। উক্ত রিপোর্টে রাজা এবং নাজির দেও ও দেওয়ান দেও-এর অধিকার সম্বন্ধে বিস্তারিত খবর লিপিবদ্ধ ছিল। কমিশন আরও অভিমত প্রকাশ করলেন যে "কোচবিহার রাজ্যের ঝগড়া-বিবাদের সুষ্ঠু মীমাংসার জন্য ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর উচিৎ কোচবিহার রাজ্যে একজন ব্রিটিশ কমিশনার নিযুক্ত করা।"[২৫]

এরপর থেকে এই রাজ্যে রেসিডেন্ট বা রাজনৈতিক প্রতিনিধি (Agent) বলা যেতে পারে তাঁদের পাঠানো হয় রাজদরবারের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করবার জন্য। এই সমস্ত আধিকারীকদের বলা হয়েছিল রাজ্যের সমস্যাদি সমাধান করার জন্য সাহায্য করতে আর এক-ই সঙ্গে তাঁদের দেখতে বলা হয়েছিল এই রাজ্যে কোম্পানীর স্বার্থ পুরোপুরি রক্ষা করতে। রাজ্যের ভিতরে ও বাইরে বিবদমান যে কোন শক্তির মোকাবিলা করতেও তাঁদেরকে বলা হয়েছিল।

এ ভাবেই সর্বপ্রথম ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কোচবিহার রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় সোজাসুজি হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে। এটা মনে হয় যে চুক্তির শর্তানুসারে কোচবিহার রাজাকে চুক্তির পরবর্তী তারিখ থেকে মুদ্রা তৈরী, বিচার ক্ষমতা এবং অন্যান্য ক্ষমতা রাজাকে দেওয়া হয়।

"১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের পর রাজার ক্ষমতা ও সুযোগ সুবিধা আরও খর্ব করা হ'ল এবং পরবর্তীকালে রাজা হরেন্দ্র নারায়ণ যিনি

সাবালক হয়ে রাজ্যের ভার গ্রহণ করেন তাঁর সঙ্গে কোম্পানীর বিরোধ বাধে। রাজা সম্পর্কে কোম্পানীর মনোভাবের ব্যাখ্যা করে বলা চলে যে বর্তমান রাজার নাবালক অবস্থাতে রাজার সব বিষয় কোম্পানী দেখাশোনা করত, কিন্তু এটা স্পষ্ট ঘোষণা করা হয় রাজার স্বাধীন অধিকারে হস্তক্ষেপ করা কোম্পানীর ইচ্ছা নয়। আরও ঘোষণা করা হয় যে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের চুক্তির শর্তাবলী সঠিকভাবে মেনে চলা হবে।"[২৬]

তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিশ পূর্বেই এ রাজ্যের দুরবস্থার বিষয়টি জানতেন, কারণ উভয়পক্ষই সর্বদা তাঁর নিকট আবেদন পাঠাতেন। কোচবিহার রাজ্যের অন্তঃকলহ যখন চূড়ান্তভাবে উপস্থিত তখন তিনি ২রা এপ্রিল ১৭৮৮ খ্রীঃ লরেন্স মার্সার ও মি. চিবাটকে এ রাজ্যের অভ্যন্তরীণ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে রিপোর্ট পেশ করবার জন্য পাঠালেন। মার্সার ও চিবেট কমিশনের সুপারিশক্রমে গভর্ণর জেনারেল মনে করেন যে কোচবিহার রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে একজন ব্রিটিশ কমিশনার নিযুক্ত করা দরকার। সেই করণে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে হেনরী ডগ্লাস সাহেব কমিশনার নিযুক্ত হন। তিনি এসেই অশান্তিযুক্ত কোচবিহার রাজ্যে শান্তি স্থাপনে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি বিচার ও রাজস্ব সম্বন্ধীয় অফিসের কাজকর্ম নিজেই করতেন, নিম্ন আদালতে কাজকর্ম পরিদর্শন করতেন এবং সেখানকার বিচার সম্পর্কীয় মোকদ্দমার আপীল শুনতেন। "তিনি ক্রমে ক্রমে রাণী এবং তাঁর মন্ত্রীর ক্ষমতা আত্মসাৎ করেছিলেন। তিনি কলকাতার 'রেবিনিউ বোর্ডে' এবং 'সদর দেওয়ানী আদালতে' তাঁর ত্রৈমাসিক রিটার্ণ পাঠাতেন। এইভাবেই কোচবিহার রাজ্যের সর্বস্তরে ব্রিটিশ প্রভাব পড়েছিল।"[২৭]

রাজা, নাজির এবং দেওয়ান দেও-এর মধ্যে দ্বন্দ্বের জন্যই রাজ্যে প্রথম কমিশনার নিযুক্ত হয়েছিল। এর ফলে চিরাচরিত শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তন সাধিত হল এবং নাজির দেও যিনি সৈন্য বিভাগের প্রধান হিসাবে দীর্ঘদিন যাবৎ ক্ষমতা ভোগ করে আসছিলেন তাঁর ক্ষমতা কিছুটা হ্রাস করা হ'ল। এইভাবে কমিশনার নিযুক্তিতে অর্থাৎ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সাক্ষাৎ প্রতিনিধি নিযুক্তিতে কোচবিহারের শাসন ব্যবস্থায় এক নূতন অধ্যায়ের শুরু হ'ল।

হেনরী ডগলাস মূলত রাজ্যের রাজস্ব ব্যবস্থাকে ঠিকমত পরিচালনা করতেন। তবে একথা উল্লেখযোগ্য যে ভূমি রাজস্ব সংস্কার সম্পর্কে কোম্পানীর কমিশনাররা যতটা সচেতন ছিলেন, অন্যান্য অব্যবস্থা সম্পর্কে ততখানি আগ্রহ তাঁদের মধ্যে দেখা যায় না। মনে হয় কোম্পানীর বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি সম্পর্কে সচেতনতা-এর অন্যতম কারণ। তবে একথা ঠিক যে জনসাধারণের অনাগ্রহ সে সঙ্গে উচ্চতর কর্মচারীদের বিরোধিতা কোচবিহার রাজ্যে ব্রিটিশ নিযুক্ত কমিশনারদের যথাযথভাবে কাজ করতে দেয়নি।

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণ সাবালক হন। মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণের রাজত্বকাল কোচরাজবংশের এক স্মরণীয় অধ্যায়। হরেন্দ্র নারায়ণ রাজ্যের রাজনীতিতে ব্রিটিশ হস্তক্ষেপ কোনমতেই সহ্য করতে পারছিলেন না। যদিও শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোনও পরিবর্তন তিনি আনতে সক্ষম হননি। যাইহোক কমিশনারদের কোচবিহার রাজ্য থেকে ফিরিয়ে নেবার জন্যে তিনি ব্রিটিশ সরকারকে অনুরোধ করেন। " ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর এই সময় গভর্ণর জেনারেল ছিলেন 'লর্ড ওয়েলেস্‌লী'। আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী নীতিতে বিশ্বাসী ওয়েলেস্‌লী কোচরাজের এই মনোভাব সহ্য করতে রাজী ছিলেন না। তবে কোচবিহারের ক্ষেত্রে তিনি জোর করে কোন কিছু করারও পক্ষপাতী ছিলেন না। হরেন্দ্র নারায়ণকে বলা হল কোচবিহারে প্রচলিত 'ব্রিটিশ রেগুলেশনস্' প্রবর্তিত করার জন্য যাতে কোচরাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে আসে কিন্তু হরেন্দ্র নারায়ণ রাজী হলেন না।" [২৮]

রঙ্‌পুরের কালেক্টরগণ রাজস্ব আদায়ের ভার গ্রহণ করে এ রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে লাগলেন। তাঁরা সময়-সময় রাজার টাকশালও বন্ধ করে দিতেন। কারণ এই টাকা দ্বারা বিনিময় কার্য্য সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা যায় না। কোন সময় এরূপ আদেশ করতেন যে, হাজারের বেশী টাকা মাসে ছাপানো হবে না। আদেশ লঙ্ঘন করলে রাজকর্মচারীগণকে কারাদণ্ড দেয়া হ'ত।

কোচরাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণের রাজত্বকাল একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

পালন করে। মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণের বিচক্ষণতা ও অনমনীয়তার জন্যে কোচবিহার একটি সামান্য জমিদারীতে পরিণত হতে পারে নি। তবে মহারাজার উদাসীনতা ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের ক্ষমতালিপ্সা এবং স্বার্থপরতার জন্যে রাজ্যে গোলযোগ ও অব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। ভূটান পুনঃ পুনঃ কোচবিহার সীমান্তে অনুপ্রবেশ করতে থাকে। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণের মৃত্যু হয়। মহারাজের জীবিতাবস্থায়ই ইংরেজ সরকার তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র শিবেন্দ্র নারায়ণকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। যদিও এই সিদ্ধান্ত গোপন রাখা হয়েছিল। কাজেই হরেন্দ্র নারায়ণের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দিলেও শেষ পর্যন্ত শিবেন্দ্র নারায়ণ-ই সিংহাসনে বসেন। প্রকৃতপক্ষে এই সময় থেকেই কোচবিহারের শাসনব্যবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। রাজপরিবারের দিক থেকেও ইংরেজ শাসন গ্রহণে আর কোন বাধা বা প্রতিবাদ পরিলক্ষিত হয় নাই। শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং শাসনব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে পাশ্চাত্য প্রভাব পরিলক্ষিত হয় এবং সেই সঙ্গে কোচবিহারের ইতিহাসে 'আধুনিক যুগ'-এর সূচনা হয়েছিল। এই কারণেই ঊনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে যখন প্রায় প্রতিটি দেশীয় রাজার সাথেই ইংরেজ সম্পর্ক তিক্ত, কোচবিহারে কিন্তু তখন-ই ইংরেজদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়েছিল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের 'মহাবিদ্রোহের' পর মহারাণীর ঘোষণায় (Queen's Proclamation) এবং ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দর 'সনদে' কোচবিহারের রাজাকে 'মহারাজা বাহাদুর' ঘোষণাদ্বারা এই সম্পর্ককে আরও স্থায়ী করা হয়।

"১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কাশীতে মহারাজা শিবেন্দ্র নারায়ণের মৃত্যু হলে মহারাজা নরেন্দ্র নারায়ণ কোচবিহারের সিংহাসনে আরোহন করেন কিন্তু তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৬ বৎসর। রাজার প্রার্থনানুসারে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট তাঁকে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে পাশ্চাত্য ইংরাজী শিক্ষার জন্য পাঠান এবং তদানীন্তন সরবরাকার সাহেব ব্রজেন্দ্র নারায়ণকে রাজ্যের ও জমিদারীর ম্যানেজার নিযুক্ত করেন।"[২৯]

" মহারাজা শিবেন্দ্র নারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁর পোষ্যপুত্র এবং পরবর্তী মহারাজা নরেন্দ্র নারায়ণের সময়ে রাজ্যের সমস্ত রাজনৈতিক কার্যকলাপ 'বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট '-এর অধীনে আসে। শাসনব্যবস্থার সার্বিক স্তরে সংস্কার প্রবর্তিত হয়। বিচার ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করা হয় এবং জনসাধারণকে শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়। 'রাজসভা'-র গুরুত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। শাসনব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক কাঠামো পরিলক্ষিত হয়।"[৩০] এক্ষেত্রে উল্লেখ্য ঃ "In 1848, the territory of CoochBehar, so long as it might be managed or superintended in its management, was placed under the jurisdiction of Government of Bengal, all questions, however, of an important political bearing referred to the Supreme Court." [৩১] মহারাজা নরেন্দ্র নারায়ণের রাজত্বকালে ভূটিয়াদিগের দৌরাত্ম পুনরায় আরম্ভ হয়। ভূটিয়ারা কোচবিহার রাজ্য থেকে কয়েকজন লোককে ধরে নিয়ে যায়। উক্ত বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি মোকাবিলা করবার জন্য কোচবিহারের মহারাজা পুণ্ডিবাড়িতে কিছু সৈন্য পাঠিয়ে দেন এবং ইংরেজ সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করেন কিন্তু ইতিমধ্যে ভূটানরাজের কাছ থেকে বন্ধুত্বপূর্ণ চিঠি পাওয়ায় উক্ত সাহায্যের আর প্রয়োজন হয় নাই। মহারাজা নরেন্দ্র নারায়ণের রাজত্বকালে ব্রিটিশ সরকারের সহযোগিতায় কোচবিহারের সমাজ সংস্কার ও শিক্ষার ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধন হয়েছিল। নরেন্দ্র নারায়ণ ছিলেন আধুনিক পাশ্চাত্য ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত। "১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন মধ্যযুগীয় চিন্তাধারার ঘৃণ্যতম 'সতীদাহ' প্রথা ইংরেজ সরকারের সহযোগিতায় আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।"[৩২] ব্রিটিশ সরকারের এজেন্ট Colonel Jenkins-এর সহযোগীতায় ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে কোচবিহার রাজ্যে একটি ' ইংরাজী বিদ্যালয় ' স্থাপিত হয়েছিল। "Colonel Jenkins—এর সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতার জন্য উক্ত বিদ্যালয়টির নামকরণ হয়েছিল "Jenkins School."[৩৩] "মাত্র ২২ বৎসর বয়সে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট অথবা ২২শে শ্রাবন বৃহস্পতিবার মধ্যরাত্রে মহারাজা নরেন্দ্র নারায়ণ তার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন।"[৩৪]

মহারাজা নরেন্দ্র নারায়ণের মৃত্যুর পর আবার রাজসিংহাসন নিয়ে কোচবিহার রাজ্যে শুরু হয়ে গেল পারিবারিক অন্তঃকলহ। উক্ত বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সুষ্ঠু সমাধানে এবং একটি শান্তিপূর্ণ স্থিতিশীল অবস্থায় কোচবিহার রাজ্যকে ফিরিয়ে আনতেও ব্রিটিশ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

মহারাজা নরেন্দ্র নারায়ণের মৃতদেহ রাজবাড়ীতে শায়িত অবস্থায় থাকাকালীন একদিকে পাটরানী নিস্তারিনী দেবী

নিজঅধিকারবলে কুমার যতীন্দ্র নারায়ণকে (নরেন্দ্র নারায়ণের অবৈধ স্ত্রীর সন্তান কিন্তু নিস্তারিনীর ভগ্নীপুত্র) সিংহাসনে অভিষেক করানোর আয়োজন করছেন অপরদিকে দেওয়ান নীলকমল স্যানাল, নবকান্ত মজুমদার, মহারাণী বৃন্দেশ্বরী ও কামেশ্বরী দেবীর সহায়তায় মাত্র ১১ মাস বয়স্ক রাজকুমার নৃপেন্দ্র নারায়ণকে কোচবিহারের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠান করানো হয়। শুরু হয়ে গেল তীব্র পারিবারিক অন্তঃকলহ।

এই সময় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে একজন উকীল রাজধানীতে উপস্থিত থাকার নিয়ম ছিল; তিনি কোচবিহার রাজ্যের সমস্ত ঘটনা ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টকে জানাতেন। "সেই কারণে মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের সিংহাসন প্রাপ্তির বিষয় সম্পর্কিত একখানি রিপোর্ট রঙ্‌পুর ডাকঘরে পাঠান হ'ল। তদানীন্তনকালে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের উকীল ছিলেন পীতাম্বর চট্টোপাধ্যায়।"[৩৫]

সেই সময় ব্রিটিশ গভর্ণর জেনারেলের নিকট ২২ দফার একখানি আবেদন পত্র দেওয়া হয়েছিল। আবেদন পত্রের মর্ম্ম এই যে, "মহারাণী নিস্তারিণী রাজ্যের বর্ত্তমান কর্ত্রী। স্বামীর তলবার ও সিংহাসন তিনি রক্ষা করিবেন। রাজার অগ্রজ কুমার যতীন্দ্র সিংহাসনের অধিকারী। দেওয়ান নীলকমল, নবকান্ত প্রভৃতি অবৈধরূপে তাঁহার আজ্ঞা অবহেলা করিয়া বালক নৃপেন্দ্রকে সিংহাসন প্রদান করিয়াছে, এই অন্যায় কার্য্যে গবর্ণমেন্ট কদাপি সম্মতি দিতে পারে না।"[৩৬] উল্লিখিত আবেদনের মর্ম্ম তদন্তের জন্য বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট মাননীয় হটনকে প্রেরণ করলেন।

কর্ণেল হটন কোচবিহারের সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে যে Report-টি ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টকে দিয়েছিলেন তার আংশিক অংশ নিম্নে বর্ণিত হল ঃ

"3rd A son Nrependra Narayan by a Gundhurba Biba, Union with Nishimayee. This child is a aged thirteen months. The birth of the first and third children was reported to Governor General's Agent but not that of the Second."

3. The Late Maharajah is said to have executed a document prior to his death in the nature of a will, appointing Nrepender Narayan as his heir. The authenticity of that document is a matter of enquiry, and will be reported hereafter. No one interested, however, has up to the present time expressed any doubt as to the youth in question being that Rajah Lawful heir, or that it was the Rajah's intention to make any other appointment.

উপরিউক্ত রিপোর্ট-এর ভিত্তিতে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন তা নিম্নরূপ ঃ

"3. Nrip-Indra Narain is accordingly recognised and confirmed a Rajah of CoochBehar in succession to his father. The question of investing him with title of Maharajah will remain in obeyance until he arrives majority." ব্রিটিশ সরকার তথা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ৫ই এপ্রিল কোচবিহার রাজ্যের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের পরে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করে কোচবিহারের শাসনকার্য্য শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বেতনভুক আধিকারিকের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার উক্ত কাজ সমাপ্ত করেছেন। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, "Practically, however, the administration of the country has been left to successive Rajahs, first under the collector of Rangpur ; then under a series of commissioners appointed to CoochBehar ; latterly under the Agent to the Governor General, North East Frontier ; and though provision was made in regulation III." যখন কোচবিহারে কমিশনার নিযুক্ত হ'ল তখন তাঁর বেতন ছিল মাসিক ২০০০.০০ টাকা এবং কোচবিহার ট্রেজারির থেকেই উক্ত বেতন দেওয়া হ'ত। তবে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ কমিশনারগণের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ ছিল, " The commissioner will give his first attention to the finances of the Estate, and furnish a special report thereon." নাবালক রাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের রাজত্বকালে ব্রিটিশ কমিশনারদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল নাবালক রাজাকে

আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। ব্রিটিশ কমিশনারগণ উক্ত কর্তব্যে যথার্থ ভূমিকা পালন করে কুসংস্কারাচ্ছন্ন কোচবিহার রাজ্যকে নূতন আলোর সন্ধান দিতে সাহায্য করেছিলেন।

এই আলোচনার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী স্বার্থান্বেষী নীতি গ্রহণ করলেও সামাজিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে কোচবিহারের পত্তন হয়েছিল ব্রিটিশ সংশ্রবের প্রভাবেই, এতে কোন সন্দেহ নেই। মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণের শাসনকাল, তাঁর আধুনিক প্রগতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী অনেকটাই ব্রিটিশ সংশ্রবের ফল।

সূত্র ঃ

১. কুচবিহার Select Record Vol II কুচবিহার 1869 P - 202
২. কোচবিহারের ইতিহাস/খাঁ চৌধুরী আমানত উল্লা আহমেদ পৃঃ ৮৭
৩. The History of Mughal North Eastern India / S. N. Bhattacharjee PP - 77-78
৪. The Journal of the Asiatic Society of Bengal Vol XVIII Part II July-December 1849 P-704
৫. Proceeding of the Govt. of Bengal (Political) August 1905 No 6 P-131
৬. Select Record of COB Vol II PP - 151-154
৭. Proceeding of Govt. of Bengal (political) Aug. 1905 No 6 P - 131
৮. কোচবিহারের ইতিহাস (সংযোজন অংশ)/সম্পাদনায় ড. নৃপেন্দ্রনাথ পাল পৃঃ ১১৫
৯. কোচবিহারের ইতিহাস/খাঁচৌধুরী আমানত উল্লা আহমেদ পৃঃ ১৮৮
১০. কোচবিহার ইতিহাস/ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ৭২
১১. রাজোপাখ্যান/জয়নাথ মুন্সী পৃঃ ৫৪
১২. An Account of the Embassy to Teshoolama / Samual Turner P.VIII
১৩. Proceedings of the Revenue Department Vol I No 136 PP - 363 -368.
১৪. The selection from unpublished Records of Government for the year 1748 to 1767. P - 716.
১৫. কোচবিহারের ইতিহাস/যাদব চক্রবর্তী পৃঃ ৪৬
১৬. বিষয় কোচবিহার/সম্পাদনায় ড. নৃপেন্দ্রনাথ পাল পৃঃ ১৫৯, ১৬০
১৭. The invasion of Nepal/John pemble PP - 31 32
১৮. কোচবিহারের ইতিহাস/খাঁচৌধুরী আমানত উল্লা আহমেদ পৃঃ ৩৪৪, ৩৪৫
১৯. তদেব পৃঃ ৩৪৪
২০. কোচবিহারের ইতিহাস/সম্পাদনায় ড. নৃপেন্দ্রনাথ পাল পৃঃ ৮১
২১. The selection from unpublished Records of Govt. for the year 1748 to 1767 P- 716.
২২. রাজোপাখ্যান/জয়নাথ মুন্সী পৃঃ ৭৩
২৩. তদেব পৃঃ ৮৪।
২৪. History of Cooch Behar / S. C. Ghosal P 393-398
২৫. Report on COB in 1788 / Marcer Lawrence and John D. Chauvet P - 202
২৬. Select Record Vol I P - 133 - 134
২৭. কোচবিহারের ইতিহাস / সম্পাদনায় ড. নৃপেন্দ্রনাথ পাল পৃঃ ৮৩
২৮. মধুপর্ণী বিশেষ কোচবিহার জেলা সংখ্যা ১৩৯৬-৯৭ পৃঃ ৬০
২৯. কোচবিহারের ইতিহাস - ড. নৃপেন্দ্রনাথ পাল পৃঃ ৭৯
৩০. মধুপর্ণী বিশেষ কোচবিহার জেলা সংখ্যা ১৩৯৬-৯৭ পৃঃ ৬২
৩১. Cooch Behar states and its Land Revenue settlement / H. N. Raychowdhury P - 283
৩২. Ibid P - 286
৩৩. Ibid P - 287
৩৪. নৃপেন্দ্র স্মৃতি / দীনদয়াল চৌধুরী পৃঃ ২৫
৩৫. তদেব পৃঃ ২৫
৩৬. Guide to the Records Part II 1859-1947 (General) February 1864 P - 28.